২০০৪ সালের ২৫ অক্টোবর বগুড়ায় ওঠানো ছবি। বাম থেকে সাংবাদিক আবুল হোসেন খোকন, বগুড়ার সাংবাদিক প্রদীপ ভট্টাচার্য্য শঙ্কর, সাংবাদিক শাহদৎ আলম ঝুনু, প্রখ্যাত ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, লেখক শাহরিয়ার কবীর, বিচারপতি কে এম সোবহান, ভাষা সৈনিক মুহাম্মদ আব্দুল মতীন ও বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মনা।

# সাংবাদিক আবুল হোসেন খোকন-এর একটি সাক্ষাতকার

[সাংবাদিক-লেখক ও মানবাধিকার কর্মী আবুল হোসেন খোকন তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে অনেকবার সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী এবং সামরিক শাসকদের দ্বারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ২০০১ সালে যখন বিএনপি-জামায়াত জোট রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে– তখন তিনি বগুড়ায় ছিলেন এবং ক্ষমতাসীন মহলের নির্দেশে ২০০৩ সালে চাকুরিচ্যুত হয়েছিলেন। পরে এর উপর ভিত্তি করে ২০০৪ সালের শেষ দিকে বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মনা এবং দৈনিক সংবাদ-এর নিজস্ব বার্তা পরিবেশক হাবিবুর রহমান স্বপন– আবুল হোসেন খোকনের একটি সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছিলেন। অপ্রকাশিত এই সাক্ষাতকারটি এখানে তুলে ধরা হলো।]

## সাক্ষাতকার :

**প্রশ্ন :** আপনি কোথায় কোন্ দায়িত্ব পালন করছিলেন, কবে থেকে?

**উত্তর :** আমি বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক করতোয়া'র বার্তা সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালন করছিলাম। এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলাম ২০০২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। এর আগে আমি এই সংবাদপত্রে সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দিয়েছিলাম ২০০০ সালের ১৫ জুন তারিখে। এরও আগে আমি ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মাতৃভূমি'র বিশেষ সংবাদদাতা ও বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক উত্তরবার্তা'র সহকারী সম্পাদক ছিলাম।

**প্রশ্ন :** আপনাকে চাকরিচ্যুৎ করা হয় কেন ও কবে?

**উত্তর :** আমাকে চাকরিচ্যুৎ করা হয় ২০০৩ সালের ২০ ডিসেম্বর। তার প্রায় ৩ মাস আগে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ দেয়া হয়। সাময়িক বরখাস্তের আদেশে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, 'কাউন্সিলকে সামনে রেখে রাজশাহী বিএনপি-তে কোন্দল তুঙ্গে' শিরোনামের প্রকাশিত খবরের জন্য দৈনিক করতোয়ার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। তবে এই অভিযোগ মূল কথা নয়। মূলত: বিএনপি-জামাত জোট সরকারের নীলনকশা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসীদের বিতাড়ন কর্মতৎপরতার অংশ হিসেবেই আমাকে চাকরিচ্যুৎ করা হয়।

**প্রশ্ন :** এটা আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন?

**উত্তর :** এ ব্যাপারে একটু পেছনের দিক থেকে বলতে হয়। আমি সংবাদপত্র পাঠকদের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত কলামিস্ট হিসাবে। আমি প্রায় ২২ বছর হলো বিভিন্ন সংবাদপত্রে কলাম লিখে আসছি। দৈনিক করতোয়ায়ও নিয়মিত কলাম লিখতাম এবং এখানে আমার শতাধিক কলাম প্রকাশ হযেছে। এটা পরিস্কার যে আমি '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আদর্শের অনুসারী, সততার নীতি আদর্শে বিশ্বাসী, বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা-আপোসহীনতা এবং অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে গণমানুষের স্বার্থে সত্য প্রকাশের নীতিতে বিশ্বাসী। সবচেয়ে বড় কথা হলো দেশপ্রেম, মানবপ্রেম। আমি সেটায় পুরোপুরি বিশ্বাসী। সে কারণে আমার কলামে এ বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে এসেছে। এতেকরে বিপরীত শক্তি চরম ক্ষিপ্ত থেকেছে। কিন্তু তারা আমার সততা ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে কোনরকম দুর্বলতা পায়নি। ফলে আঘাত হানার উপায় নিয়ে তারা বিপাকে ছিল। তবে ২০০১-এর অক্টোবর নির্বাচনের পর জোট সরকার আঘাত হানার জন্য বেপরোয়া হয়ে ওঠে। দৈনিক করতোয়া'য় থাকার কারণে তাদের জন্য সবচেয়ে সুবিধা হয়। কারণ দৈনিক করতোয়া'র প্রকাশক (মালিক) একইসঙ্গে সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালু তাদের আর্শীবাদপুষ্টই শুধু নয়, সরকারের সবচেয়ে প্রভাবশালী বলে কথিত হাওয়াভবনের কর্ণধার তারেক রহমানের সবচেয়ে ঘনিষ্টজন। তাই মালিক-সম্পাদকের মাধ্যমেই তারা তাদের নীলনকশা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। সে কারণে মালিক-সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালু এবং নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা তার একনিষ্ঠ দালালটি আমাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য তৎপর হয়। এক্ষেত্রে বারংবার আমার কলাম লেখা বন্ধ করে দেয়ার চেষ্টা হয়, পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনবরত সমস্যা সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু আমার সততা-সাহসীকতার কারণে এবং সেইসঙ্গে আমার প্রতি সহকর্মীদের একাত্মতা ও আন্তরিকতার কারণে সব ষড়যন্ত্রই কার্যত ব্যর্থ হয়। অত:পর মরিয়া তৎপরতার অংশ হিসাবে বেআইনি ও স্বেচ্ছাচারিভাবে প্রথমে আমাকে সাময়িক বরখাস্ত, পরে চূরান্তভাবে বরখাস্ত করা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাকে সাময়িক বরখাস্ত করার বেশ কয়েক দিন আগে সংবাদ বিভাগের সবার সামনে মালিক-সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালু আমার উদ্দেশ্যে কড়া ভাষায় কৈফিয়ৎ চান এই বলে যে, আমি কেন জেনারেল জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বলিনা, কেন তার সামরিক শাসনামলে হাজার হাজার সেনা অফিসার হত্যার কথা লেখার মধ্যে প্রকাশ করি? তিনি এইসব লেখাকে অপ্রাসঙ্গিক এবং দৈনিক করতোয়া'র নীতিমালাবিরোধী উল্লেখ করে আরও বলেন, রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত বদরুদ্দোজা চৌধুরী লন্ডনে গিয়ে জোট সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের কড়া নজরদারিতে নাজেহাল অবস্থায় রয়েছেন–এসব তথ্য কোথায় পেয়েছি? জবাবে বলেছিলাম, দৈনিক জনকণ্ঠ থেকে তথ্যগুলো নেয়া এবং সেকথা আমার লেখার মধ্যেই উল্লেখ করা আছে। এই জবাবে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বলেন, দৈনিক জনকণ্ঠ হলো আওয়ামী লীগের পত্রিকা, সব মিথ্যা কথা লেখে। ওই পত্রিকার তথ্যের কোন সত্যতা নেই। তিনি অত্যন্ত অশোভন ভাষায়

হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আমাকে বলেন, "জামায়াতের বিরুদ্ধে কথা বলো, তাদের '৭১-এর ঘাতক-দালাল বলো, দাঁড়াও ঘাতক বলার সাধ মিটিয়ে দিচ্ছি, তোমাকে ঘাতক (?) কীভাবে বানাতে হয় দেখিয়ে দিচ্ছি।"

এই হুমকির কয়েকদিন পরেই আমার হাতে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ ধরিয়ে দেয়া হয়। তখন ছিল সন্ধ্যে সাড়ে ৭টা মতো। আমি এই বে-আইনি আদেশটি তখন আমার পাশে বসা সহকর্মীদের দেখাই এবং শেষে বেরিয়ে আসবার আগে নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা মালিক-সম্পাদকের দালালটির নিকট তার রুমে যাই। তার কাছে জানতে চাই, এই বে-আইনি আদেশের ব্যাপারে তার বক্তব্য কি? এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মালিক-সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালু সাময়িক বরখাস্ত আদেশটি সাক্ষর করেই বগুড়া ত্যাগ করে ঢাকায় চলে যান। সে কারণে নির্বাহী সম্পাদকের কাছে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। নির্বাহী সম্পাদক ইনিয়ে-বিনিয়ে যা বলেন তার মূল কথা হলো, এভাবে তো আদেশ দেয়া যায় না। আসলে মালিক তো আপনার ওপর ক্ষিপ্ত, সে কারণে এ কাজ করেছে। আসলে নিয়ম অনুযায়ী তো আপনি সাসপেন্ড হবার আগে আমি (নির্বাহী সম্পাদক) সাসপেন্ড হবার কথা। সে (মালিক) নিয়ম কানুন সম্পর্কে জানে না বলেই এ কাজ করেছে। এখন আর কী করবেন, ধৈর্য্য ধরে সব মেনে নিন আর কি।

এক পর্যায়ে তিনি বললেন, আপনাকে বরখাস্ত করার মূলে আছে সরকারের উচ্চ পর্যায়। বিএনপি থেকে আপনাকে সরিয়ে দেবার জন্য বলা হয়েছে। মালিকের পক্ষে এই দাবি অগ্রাহ্য করা সম্ভভ নয়। আপনি কেন যে এতো শক্তিশালী মহলের সমালোচনা করেছেন! আমার কথামতো আমার পক্ষে থাকলে কখনও কোন সমস্যা হতো না।

এসব কথা বলার ফাঁকে তিনি বগুড়া জেলা বিএনপি'র প্যাডে লেখা দলের সাধারণ সম্পাদক সাক্ষরিত কয়েক পৃষ্ঠার চিঠিটি বের করলেন। হাতে নেয়ার পর সেটি আমি পড়লাম। চিঠিতে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা কয়েকদিন আগে মালিক-সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালু সবার সামনে অফিসের ভিতরেই আমাকে বলেছিলেন। তবে চিঠিতে যে দাবি বা আদেশ করা হয়েছে তা হলো, অনতিবিলম্বে আমাকে দৈনিক করোতোয়া থেকে অপসারণ করতে হবে, এবং আমার কলামগুলো প্রকাশ হওয়ার জন্য দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষকে পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে ক্ষমা প্রার্থণা করতে হবে (এই ক্ষমা প্রার্থণার ঘোষণাটি দৈনিক করতোয়ায় ৪-এর সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশ করা হয়েছিল ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে)।

বললাম, আমি বে-আইনি আদেশের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবো। তিনি তখন ভিন্নরূপ ধারণ করলেন এবং অনেকটা হুঁশিয়ারি উচ্চারণের ভাষায় বললেন, খবরদার এই কাজের চিন্তা করবেন না। এই সাসপেন্ড আদেশের কথা কাওকে বলবেন না । বললে আপনারই ক্ষতি হবে। জানেন তো মালিকের টাকার অভাব নেই। আপনার মতো বহু আবুল হোসেন খোকনকে সে গিলে খেয়ে ফেলতে পারে। আপনি কোন পদক্ষেপই নিতে পারবেন না। কেও আপনার পক্ষে দাঁড়াবে না, কাওকে পাশে পাবেন না। কাজেই কোন পদক্ষেপ নেবেন না এবং এ ঘটনা কাওকে বলবেন না।

এরপর আমি বেরিয়ে এসেছিলাম এবং বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দসহ প্রয়োজনীয় সকল মহলকে ঘটনা জানিয়েছিলাম।

**প্রশ্ন :** এরপর কী হলো?

**উত্তর :** এরপর বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের একটি জরুরি সভা ডাকা হয়েছিল অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে, যাতে দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষের সেই দালালটিও উপস্থিত হয়েছিল। কারণ এই দালালটিও সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য। এই সভায় আমাকে বে-আইনিভাবে সাময়িক বরখাস্ত করায় প্রতিবাদ,

নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কয়েকজন ইউনিয়ন নেতার আলোচনা করাসহ বে-আইনি আদেশ প্রত্যাহার করা না হলে আদালতে মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত হয়। পরে নেতৃবৃন্দ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়না।

**প্রশ্ন :** তারপর আপনি মামলা করলেন?

**উত্তর :** না, আইন অনুযায়ী তাৎক্ষণিক মামলা করার অবকাশ ছিল না। প্রথমে আমি আমার আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করি এবং দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষকে পিটিশন পাঠাই। আইন অনুযায়ী যতোদিন অপেক্ষা করার–তা করি। আইনজীবীর পরামর্শমতো মালিক-সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালুর সঙ্গে দেখাও করি। তখন মোজাম্মেল হক লালু জানিয়ে দেন আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এরপর মামলা করি।

**প্রশ্ন :** কবে আপনাকে বরখাস্ত করা হলো এবং কবে কোথায় মামলা করলেন?

**উত্তর :** আমাকে বরখাস্ত ঘোষণা করা হয় ২০০৩ সালের ২০ ডিসেম্বর। আমি মামলা দায়ের করি ২৪ জানুয়ারি ২০০৪ সালে রাজশাহী বিভাগীয় শ্রম আদালতে। মামলার নম্বর হলো ০২/২০০৪।

**প্রশ্ন :** আপনার এসব পদক্ষেপে অপর পক্ষে প্রতিক্রিয়া কী হলো?

**উত্তর :** এ প্রসঙ্গে একটু বলতে হয়। আমি সাময়িক বরখাস্ত আদেশ পাবার পর যখন মালিক-সম্পাদকের দালাল নির্বাহী সম্পাদকের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করি, অর্থাৎ বে-আইনি সাসপেন্ড আদেশের বিষয়টি তার কথামতো গোপন না রেখে সাংবাদিক ইউনিয়নে উত্থাপণ করি এবং প্রয়োজনীয় সকল মহলকে জানিয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেই, তখনই মালিকের এই দালাল রাখ-ঢাক না রেখে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের যে সভাটি হয়েছিল, সেখান থেকেই সে একটি ইস্যু তৈরির চেষ্টা করে। সে ইউনিয়নের সভার পর মালিক-সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালুকে জানায় যে, সভায় আমি নাকি তাকে (মোজাম্মেল হক লালুকে ) অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছি এবং তাকে 'মূর্খ' বলেছি। এরপর এই 'মূর্খ বলার' প্রতিবাদে আমার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনার জন্য দৈনিক করতোয়ায় কর্মরত সকল সাংবাদিকের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। মালিকের সঙ্গে যোগসাজসে সকল সাংবাদিককে এই হুমকি দেয়া হয় যে, এই নিন্দা প্রস্তাবে সাক্ষর না করলে চাকরিচ্যুৎ করা হবে। এরপর দালাল এবং মালিকের চাপের মুখে সব সাংবাদিককে ওই প্রস্তাবে সাক্ষর দিতে বাধ্য করা হয়। এভাবে সাক্ষরদানকারীরা বিবেকের তাড়ণায় দংশিত হয়ে আমাকে সব ঘটনা জানিয়েছেন এবং আত্মঘাতি অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। তারা অবশ্য চাকরি হারানোর ভয়ে বিষয়টি চাপা রাখার জন্য বলেছেন। কেননা মালিকের দালালটি তাদের জন্য চরম হুমকি হিসাবে কাজ করছিল।

**প্রশ্ন :** এই দালালটির নাম কি?

**উত্তর :** তার নাম ফারুক তালুকদার। ঢাকায় অনেকে তাকে মদন বলে চেনেন। সে শুধু দালালই নয়, বগুড়ায় সাংবাদিক সমাজে সে একজন দুর্নীতিবাজ ও নৈতিকভাবে চরিত্রহীন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। দুর্নীতিবাজ সাংবাদিক তৈরির মূল হোতা এখন তিনিই। এসব ব্যাপারে তদন্ত করলে তার বিরুদ্ধে এতো অভিযোগ পাওয়া যাবে- যা কল্পনারও বাইরে।

**প্রশ্ন :** মামলায় আপনি কী অভিযোগ আনায়ন করেন?

**উত্তর :** দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়টিই ছিল মামলার মূল। তার বিরুদ্ধে আমি স্বেচ্ছাচারিতা, শ্রম আইন ও ওয়েজবোর্ড বিধান লঙ্ঘন, বিভিন্ন বে-আইনি তৎপরতা এবং আমাকে বে-আইনিভাবে চাকরচ্যিুৎ করার অভিযোগে মামলা দায়ের করি।

**প্রশ্ন :** প্রতারণার বিষয়গুলো আরেকটু পরিস্কার করবেন কি?

**উত্তর :** প্রতারণার অভিযোগ অনেক। যেমন আমাকে সাময়িক বরখাস্ত আদেশে আমার পদবীর ব্যাপারে প্রতারণা করেন। আমি বার্তা সম্পাদকের পদে থাকা সত্ত্বেও তিনি আদেশপত্রে উল্লেখ করেছেন ‘শিক্ষানিবাস সহ সম্পাদক’ (হয়তো শব্দটিও তার সঠিকভাবে জানা নেই। যে কারণে শিক্ষা নবিস-এর বদলে তিনি শিক্ষানিবাস লিখেছেন একাধিক জায়গায়) বলে। শুধু তাই নয়, আমি তার সংবাদপত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত সাংবাদিক নয় বলে উল্লেখ করেন। অথচ তার এমন উল্লেখ ঠিক নয়। এ ব্যাপারে আমার যাবতীয় প্রমাণপত্র আদালতে উপস্থাপন করেছি।

**প্রশ্ন :** আপনি বলছেন আপনাকে সাময়িক বরখাস্ত এবং বরখাস্ত করা বে-আইনি ছিল। কীভাবে বে-আইনি ছিল?

**উত্তর :** কাওকে সাময়িক বরখাস্ত বা পুরোপুরিভাবে বরখাস্ত করতে হলে অভিযোগ থাকতে হয়। তারপর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শো-কজ বা কারণ দর্শাও নোটিশ করতে হয়। এটা সাময়িক বরখাস্ত করেও করা যায়, না করেও করা যায়। আমাকে ‘কাউন্সিলকে সামনে রেখে রাজশাহী বিএনপি-তে কোন্দল তুঙ্গে’ শিরোনামের খবরটি প্রকাশ হওয়ার জন্য কারণ দর্শাও নোটিশও দেয়া হয়েছিল, সাময়িক বরখাস্তও করা হয়েছিল। তবে আদেশে উল্লেখ করা হয়েছিল ‘আপনাকে আজ (২২/০৯/২০০৩) হতে আগামী ১৫ই অক্টোবর পর্যন্ত বিনা বেতনে সাময়িক বরখাস্ত করা হল।’ সেইসঙ্গে বলা হয়েছিল ‘কেন আপনাকে চূরান্ত ভাবে বরখাস্ত করা হবে না- এই মর্মে কারণ দর্শানোর জন্য আগামী ৭ই অক্টোবরের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য বলা হলো।’ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আইন অনুযায়ী ‘বিনা বেতনে’ কাওকে সাময়িক বরখাস্ত করা যায় না, তাই এ আদেশ বে-আইনি। তারপর তদন্ত কমিটি গঠনপূর্বক অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করতে হবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থণের সুযোগ দিয়ে লিখিতভাবে অভিযুক্তকে অবহিতকরণের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে পদক্ষেপ নিতে হবে। কিন্তু দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষ এসবের কিছুই করেননি। কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিভাবে পদক্ষেপ নেন, যা বে-আইনি। আমি ওই সাময়িক বরখাস্ত আদেশ পাবার পর যথাসময়ের মধ্যে অর্থাৎ ৬ই অক্টোবরে লিখিত জবাব দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে আমাকে আর কিছুই অবহিত করেননি। ফলে আমি ১৫ অক্টোবর সাময়িক বরখাস্ত আদেশের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ১৬ অক্টোবর কর্মস্থলে যোগদান করতে যাই। তখন আমাকে প্রবেশ পথে দারোয়ান দিয়ে বাধা দেয়া হয় এবং বাধাদানকারীদের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয় যে, দৈনিক করতোয়ায় আমার প্রবেশাধিকারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, তাই আমাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

এই বাধাপ্রাপ্তির পর আমি তখনই খোঁজ নিয়ে কর্তৃপক্ষের আরেকটি অবস্থান করতোয়া কুরিয়ার সার্ভিসে গিয়ে মালিক-সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালুর সঙ্গে দেখা করি। এ সময় তিনি ‘এখনও আমি সুস্থ শরীরে

রয়েছি?'- উল্লেখ করে বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং লাঞ্ছিত করার হুমকি দিয়ে চলে যেতে বলেন। তিনি উল্লেখ করেন, আমি যেন আর চাকরি করতে না আসি। উল্লেখযোগ্য যে, এভাবে আমাকে চাকরিতে যোগদান করতে না দেয়া বে-আইনি।

এরপর আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। আমি বার্তা সম্পাদক, অথচ মফ:স্বল বিভাগের মূল দায়িত্বে থাকা একটি সংবাদের বিষয়ে আমাকে অভিযুক্ত করা হলো। আসলে কোন সংবাদ প্রকাশ করা না করার দায় প্রকাশকের। এখানে আইনগত ভাবে 'কাউন্সিলকে সামনে রেখে রাজশাহী বিএনপি-তে কোন্দল তুঙ্গে' শিরোনামের সংবাদটি প্রকাশ হওয়ার দায় প্রকাশক-সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালুর। তবে তিনি যদি মফ:স্বল বিভাগের এই সংবাদটির কোন ত্রুটির জন্য কৈফিয়ৎ চান- তাহলে চাইতে হবে মফ:স্বল বিভাগের সম্পাদকের কাছে, যেহেতু সেই বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন মফ:স্বল সম্পাদক। অথচ সেখানে দায়ি করা হয়নি। আবার যদি সংবাদটির ত্রুটির জন্য সম্পাদক (মোজাম্মেল হক লালু) তার অধীনস্তদের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়ার ইচ্ছে করেন তবে এ ক্ষেত্রে চেইন অব কমান্ড অনুযায়ী চাইতে হবে। অর্থাৎ মূল সম্পাদক কৈফিয়ৎ চাইবেন ১ নং ব্যক্তি নির্বাহী সম্পাদক, ২ নং ব্যক্তি বার্তা সম্পাদক এবং ৩ নং ব্যক্তি মফ:স্বল সম্পাদকের কাছে। কিন্তু এখানে কৈফিয়ৎ নয়, ১ নং ব্যক্তি নির্বাহী সম্পাদক এবং ৩ নং ব্যক্তি মফ:স্বল সম্পাদককে বাদ দিয়ে মাঝখান থেকে ২ নং ব্যক্তি বার্তা সম্পাদককে সাসপেন্ড ও শো-কজ করা হয়েছে। আবার যদি মালিক-সম্পাদকের দাবি অনুযায়ী ধরে নেয়া হয় যে আমি বার্তা সম্পাদক নই, শিক্ষানবিস সাংবাদিক, তাহলে একজন শিক্ষানবিসের কর্তৃত্বে কোন সংবাদ প্রকাশ হতে পারে কি? কখনই পারে না। যদি পারে তাহলে বলতে হবে এই সংবাদপত্রের সম্পাদক-নির্বাহী সম্পাদক সবাই অযোগ্য ও দায়িত্বহীন। শিক্ষানবিস তাদেরই হওয়া উচিৎ। সুতরাং এখানেই পরিস্কার আমার বিরুদ্ধে গৃহিত পদক্ষেপ পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাছাড়া এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'কাউন্সিলকে সামনে রেখে রাজশাহী বিএনপি-তে কোন্দল তুঙ্গে' শিরোনামের সংবাদটি মোটেও ভুল সংবাদ ছিলনা। এ খবরটি সত্য ও সঠিক। খবরটির ব্যাপারে কোন প্রতিবাদও আসেনি। তাছাড়া এই সংবাদটি প্রায় সকল জাতীয় দৈনিকেও প্রকাশ হয়েছে। সুতরাং এখানেও পরিস্কার যে হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই আমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সাময়িক বরখাস্তের মতো ঠিক একইভাবে চূড়ান্ত বরখাস্তও বে-আইনিভাবে করা হয়েছে।

আবার বরখাস্ত বা চাকরি থেকে বাদ দিতে হলেও নিয়ম আছে। যেমন এ ক্ষেত্রে যাবতীয় বকেয়াসহ অতিরিক্ত ৩ মাসের বেতন প্রদান করতে হবে। কিন্তু দৈনিক করতোয়ার মালিক কোন বকেয়া পরিশোধ করেননি, অতিরিক্ত ৩ মাসের বেতনও দেননি, এমনকি কর্মচ্যুৎ করার সময় চলমান মাসের একটি টাকাও প্রদান করেননি।

**প্রশ্ন :** দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষের কাছে আপনার বকেয়া পাওনার পরিমান কতো ছিল?

**উত্তর :** চাকরিতে যোগদান থেকে চূরান্তভাবে বরখাস্তকালীন সময় পর্যন্ত আমাকে প্রদত্ত টাকা বাদদিয়ে মোট বকেয়ার পরিমান হয়েছিল ১৪,১৫,০৫৫.০০ টাকা ( চোদ্দ লাখ পনেরো হাজার পঞ্চান্ন টাকা )।

**প্রশ্ন :** এতো টাকা বকেয়া রেখে আপনাকে চাকরি থেকে বাদ দেয়া হলো শূন্য হাতে, এতে আপনি কীরকম অসুবিধায় পড়লেন?

**উত্তর :** এই অসুবিধার ব্যাপারটি কল্পণাও করা যায় না। সাংবাদিকতার গোটা জীবনে অসংখ্য মানুষের অসুবিধার কথা, দু:খের কথা, কষ্টের কথা, নানা যাতনার কথা লিখেছি–কিন্তু নিজের বেলায় যখন এতো

বড় ঘটনা ঘটলো তখন কাওকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না। পারলাম না আত্মসম্মানের কারণে। ফলে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা, কষ্ট এবং অনটনের মধ্যে নিপতীত হলাম। অথচ একেবারে ঘনিষ্টজন ছাড়া কাওকে কিছু বুঝতে দেইনি, দিচ্ছি না।

আমার সাংবাদিকতার বয়স ২৫ বছর। এতোগুলো বছর সততা এবং নৈতিকতা থেকে বিচ্যুত হইনি বলে এক ভয়ঙ্কর অভাব-অনটন অনবরত তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। এ থেকে কখনও মুক্ত তো হই-ই নি,বরং মাঝে মাঝেই চরম বিপর্যয়ে পড়েছি, তবু সততা-নৈতিকতা হারাইনি। অথচ এটা যারা হারাতে পেরেছেন, তাদের জন্য আমার এই পেশাটি হয়েছে আলাদিনের প্রদীপ। ২৫ বছর নয়, মাত্র ১/২ বছরেই এরা শূন্য হাত থেকে লাখোপতি-কোটিপতি বনে গেছেন (দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষের যে দালালটির কথা বলেছি, তার রাতারাতি আর্থিক উত্থানের বিষয়টি খুঁজে দেখলে এ ব্যাপারে চমকপ্রদ উদাহরণ পাওয়া যাবে)। কিন্তু আমি তা পারিনি। কারণ আমি পেশার মর্যাদা এবং নিজের আদর্শকে অনুসরণ করেছি। এ অবস্থায় যখন চাকরিটা কেড়ে নেয়া হলো তখন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। কারণ আমার তো অন্যকোন আয়ের পথ ছিল না। আমার একমাত্র আয়ের পথ ছিল দৈনিক করতোয়া থেকে পাওয়া সামান্য বেতন।

**প্রশ্ন :** সামান্য বেতন বলছেন কেন? আপনার পদ বা গ্রেড অনুযায়ী তো ভাল টাকা হবার কথা।

**উত্তর :** এখানেই তো ঠকানো বা প্রতারণার ব্যাপার। চলমান ওয়েজবোর্ড অনুযায়ী আমার মাসিক মূল বেতন ১৪ হাজার ৪'শ টাকা এবং এরসঙ্গে প্রান্তিক সুযোগ-সুবিধার পরিমান ১৮ হাজার ৪'শ ৩০ টাকা, অর্থাৎ প্রতি মাসে মোট ৩২ হাজার ৮'শ ৩০ টাকা। কিন্তু আমাকে তো তা দেয়া হয়নি। দেয়া হয়েছে কখনও আড়াই হাজার টাকা, কখনও ৩ হাজার টাকা। সর্বশেষে আমাকে দেয়া হয়েছে ৪ হাজার ২'শ টাকা। এভাবেই বিপুল অঙ্কের টাকা বকেয়া করা হয়েছে।

**প্রশ্ন :** আপনি এর প্রতিবাদ করেননি?

**উত্তর :** হ্যাঁ, করেছি। তাতে ফল হয়নি। বলা হয়েছে পরে দেয়া হবে। কিন্তু আর দেননি। শুধু ৩২ হাজার ৮'শ ৩০ টাকাই নয়, মূল বেতনের সমপরিমাণ বছরে ২টি উৎসব ভাতা এবং ২টি গ্রাচ্যুইটিও রয়েছে, যার কিছুই দেয়া হয়নি।

**প্রশ্ন :** এটা কি শুধু আপনার বেলায় ঘটেছে, না সবার বেলায়?

**উত্তর :** সবার বেলায়। এর বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিবাদে কেও এগিয়ে আসেননি। সে কারণে আমার একার পক্ষে চাপ দিয়ে সফল হওয়া যায়নি।

**প্রশ্ন :** দৈনিক করতোয়ায় এভাবে কতোজন বঞ্চিত হয়ে আসছেন?

**উত্তর :** আমার বার্তা বিভাগেই সাংবাদিকের সংখ্যা অন্ততঃ ২০ জন। এছাড়া কর্মচারিবিভাগ রয়েছে। এখন হিসাব করুন আমি একাই প্রতি মাসে বকেয়ায় পড়েছি ২৮ হাজার ৬'শ ৩০ টাকা করে। এভাবে সবার অঙ্ক যোগ করলে কী বিপূল পরিমান অর্থ দাঁড়ায়, যা ভাবাই যায় না। কর্তৃপক্ষের বিত্তের পাহাড় এমনিতেই তো বাড়েনি, এমনিতেই লালে লাল হননি। যে কেও যখন তখন গিয়ে দেখতে পাবেন মালিক-সম্পাদকের বিত্তের কী পাহাড়, সম্পদের পাহাড়! শুধু দৈনিক করতোয়া অফিসে গিয়েই বুঝতে পারবেন

যে আপনি বাংলাদেশে আছেন না পৃথিবীর সবচেয়ে বিত্তশালী দেশে আছেন। এসবই করা হয়েছে সাংবাদিক-কর্মচারিদের প্রাপ্য মজুরি না দিয়ে। অথচ এই বিত্তের মালিক সাংবাদিক-কর্মচারিরা নয়, মালিক মোজাম্মেল হক লালু। প্রতারণা, আত্মসাৎ এরই নাম। সাংবাদিক-কর্মচারিদের শ্রম ও প্রাপ্য শোষণ করে তিনি হয়েছেন রাজকীয় ঐশ্বর্য্যের মালিক, আর সাংবাদিক-কর্মচারিরা হয়েছেন ক্রিতদাস। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়। অথচ সম্মানিত পেশা বলে সাংবাদিক-কর্মচারিরা বাইরে একথা কাওকে বলতে পারেন না। নিজের পেটে ক্ষুধা নিয়ে তারা লিখে আসছেন অন্য অগণিত মানুষের ক্ষুধা ও কষ্টের কথা। এটা প্রত্যেক সৎ আদর্শবান সাংবাদিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

**প্রশ্ন :** আপনি বলছেন কার্যকর প্রতিবাদে কেও এগিয়ে আসেননি। কেন আসেননি? নিজেরা এতো বিপুল অঙ্কের মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, অথচ প্রতিবাদ করেন না, নীরবে শ্রম দিয়ে যান– এটা কেমন কথা?

**উত্তর :** এটা অবাক হবার মতো কথাই বটে। অথচ বাস্তবতা এটাই। বিষয়টি পরিষ্কার করতে হলে একটু বলতে হয়। কথা হলো, এক শ্রেণীর কাগজ আছে যেখানে আইন বা বিধান অনুযায়ী কোন রকম মজুরি দেয়া হয় না, কর্তৃপক্ষ আইন বা বিধানকে ফাঁকি দিয়ে কাগজ বের করেন। এ ক্ষেত্রে তার কাগজে কর্মরত সাংবাদিক-কর্মচারিদের মজুরির নামে সামান্য কিছু টাকা দেন, যার পরিমান একেবারেই হাস্যকর। কোন কোন কাগজে আবার তাও দেয়া হয় না। যাই হোক, এই সাংবাদিক-কর্মচারিদের কোন রকম নিয়োগপত্র না দিয়ে একটি আইডেন্টি কার্ড দেয়া হয়, এবং সেইসঙ্গে আকার-ঈঙ্গিতে বলে দেয়া হয় যে–'এই কার্ড দিয়ে যেভাবে পারো করে খাও।' স্বাভাবিক ভাবেই কার্ডধারী 'সাংবাদিক' মানুষকে ব্লাক মেইলিং করে বা হলুদ সাংবাদিকতা করে পুষিয়ে নেয়। কারণ বুঝতেই পারছেন, একজন সাংবাদিককে তার সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে যদি বর্তমান বাজার অনুযায়ী মাসিক নুন্যতম ১২ হাজার টাকা প্রয়োজন হয়, আর সেখানে যদি সে তার কর্মস্থল থেকে মাত্র দেড় বা দুই হাজার টাকা মজুরী পায়– তাহলে সে চলবে কী করে? স্বাভাবিক ভাবেই তাকে কর্তৃপক্ষের আকার-ঈঙ্গিত অনুযায়ী যেভাবে পারে সেভাবে আয় করে চলতে হয়। আসলে এভাবে অবৈধ পন্থায় বা দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে চলার জন্য সাংবাদিক-কর্মচারিরা দায়ী নয়, মূলত: দায়ী ওই কাগজের কর্তৃপক্ষ। এরকম কর্তৃপক্ষ মানেই দুর্নীতির গডফাদার, তাদের কারণেই সাংবাদিক-কর্মচারিরা দুর্নীতিপরায়ণ হয়, ব্লাক মেইলার হয়, হলুদ সাংবাদিক হয়। এরজন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী সংবাদপত্র বিষয়ক বিধান ভঙ্গকারী বা ওয়েজবোর্ড বিধান ভঙ্গকারী কর্তৃপক্ষ। আমি যে শ্রেণীর কর্তৃপক্ষের কথা বলছি- তা থেকে দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষ আলাদা কিছু নয়। এই কর্তৃপক্ষও আইন বা বিধান অনুযায়ী কোন রকম মজুরি দেন না, কর্তৃপক্ষ আইন বা বিধানকে ফাঁকি দিয়ে কাগজ বের করেন। অথচ ওয়েজবোর্ড বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক। ১৯৯৬ সালের ৯ অক্টোবর পুনর্গঠিত ওয়েজবোর্ড সংগঠনের (পঞ্চম ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ) তারিখ থেকে [গেজেট আকারে প্রকাশিত ওয়েজবোর্ডের পৃষ্ঠা-৪৬] এই বিধান বাধ্যতামূলক। এখানে ১৯৭৪ সালের Newspaper Employees ( Condition of Service ) Act-এর ১৬ ধারায় বলা হয়েছে "অন্য আইন বা চুক্তিতে যাই থাকুক না কেন–এই আইনের বিধান কার্যকর হবে।" ১৩ ধারায় বলা হয়েছে "সংবাদপত্রের/সংস্থার সাথে যুক্ত সকল নিয়োগকর্তা বোর্ডের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য। বোর্ড যে বেতন বিধান নির্ধারন করবে, তার কম বেতন কোন নিয়োগকর্তা সংবাদপত্রের কর্মচারিকে দিতে পারবেন না।" অথচ এ আইন মানা হচ্ছে না। এভাবে কর্তৃপক্ষ একদিকে সাংবাদিক-কর্মচারিদের ফাঁকি দেন, তাদের হক আত্মসাৎ করে লালে লাল হয়ে যান, সাংবাদিক-কর্মচারিদের চরিত্র ধ্বংস করেন, আরেকদিকে কর্তৃপক্ষ আইন বা বিধান ভঙ্গ করে সরকারকে ফাঁকি দিয়েও বিপূলভাবে লাভবান হন। এ ছাড়া কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রের প্রভাবকে ব্যবহার করে নানাভাবে ফায়দা হাসিল করেন তো বটেই। এই প্রেক্ষাপটে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া কোন সাংবাদিক-কর্মচারির

পক্ষে কর্তৃপক্ষের আইন বা বিধান ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূখর হওয়া কঠিন। যাইহোক দৈনিক করতোয়ার সব সাংবাদিক-কর্মচারিরা যে দুর্নীতিপরায়ণ তা কিন্তু আমি বলছি না। এখানে কর্তৃপক্ষের উল্লেখিত দালালটির নেতৃত্বে কেও কেও দুর্নীতিপরায়ণতার শিকার হলেও অনেকে নানাভাবে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে থাকেন। যেমন কেও কম টাকা পেয়েও চাকরি হারানোর ভয়ে নীরব থাকেন, অন্য কোন পার্টটাইম কাজ করে চলার চেষ্টা করেন। পার্টটাইম কিছু করার সুযোগ না পেলে অতি কষ্টে- অনটনে চলার চেষ্টা করেন। কেও-বা চাকরির পাশাপাশি অন্য কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বা ঠিকাদারি করে চলেন। যা কখনই কোন সাংবাদিক-কর্মচারির জন্য আইনি বা বিধানগত কর্ম নয়। এইসব জগাখিচুরি অবস্থার কারণে অনেক সময়েই অনেকের পক্ষে কার্যকর প্রতিবাদ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু আমি সব সময়েই এসবের প্রতিবাদ করেছি, সংবাদপত্রকে সত্যিকার অবস্থানে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছি। কারণ আমি পেশাদার সাংবাদিক, আমার অন্য কোন পেশা বা কর্ম নেই। নৈতিকতার প্রশ্নে আমি সম্পূর্ণ আদর্শবান, আমার কোন দুর্বলতা নেই। কাজেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আমার কোন ভয় বা ভীতি নেই। সততায় আমার কোন খুঁত আছে বলে আমি মনে করি না। এ ব্যাপারে শক্রপক্ষেরও অভিযোগ করবার ক্ষমতা নেই। আর আমি ক্রিতদাস হবার মানুষও নই, যে কারণে চাকরি হারাবার ভয়ও আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায়নি।

**প্রশ্ন :** আপনাকে অবৈধভাবে সাময়িক বরখাস্ত ও চাকরিচ্যুৎ করার ঘটনায় আপনি কি উচ্চ পর্যায়ে, অর্থাৎ মামলা দায়েরের আগে গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলেছিলেন? না নিজে একাই মামলা দায়েরের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

**উত্তর :** আমি আগেই বলেছি প্রথমে আমি আমার সহযোদ্ধা বন্ধুদের সঙ্গে, বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সঙ্গে এবং বগুড়াসহ বিভিন্ন স্থানের শুভাকাঙ্ক্ষিদেরকে বিষয়টি জানিয়েছি, তাঁদের পরামর্শ নিয়েছি। এরপর জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শও নিয়েছি। যেমন প্রথমেই আমি আমার কেন্দ্রীয় সংগঠন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ইকবাল সোবহান চৌধুরীর অভিমত নিয়েছি, ইউনিয়নের আরও নেতাদের মতামত নিয়েছি। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহরিয়ার কবির, সাধারণ সম্পাদক কাজী মুকুল, প্রবীণ সাংবাদিক কামাল লোহানীসহ জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন নেতৃবর্গ ও ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা সবাই মামলা দায়েরের পরামর্শ দিয়েছেন। এরপর আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে মামলা দায়ের করেছি।

**প্রশ্ন :** আপনার বিরুদ্ধে দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষের নিবর্তনমূলক পদক্ষেপের ঘটনায় বগুড়ার সাংবাদিক সমাজ বিশেষ করে আপনার হাউজের সাংবাদিকরা যথাযথ ভূমিকা রাখেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

**উত্তর :** কথাটি ঠিক নয়। একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে, বগুড়ায় কর্মরত সকল সাংবাদিকই বহুমুখী নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার। তাদের হাত-পা নানাভাবে শৃঙ্খলিত। তারা একদিকে মালিকপক্ষের অকল্পনীয় স্বেচ্ছাচারিতার শিকার হচ্ছেন, ভয়াবহভাবে শোষণনীতির শিকার হচ্ছেন, অপরদিকে কূটকৌশলের ফাঁদে পড়ে নিজের স্বাধীনতা হারিয়েছেন। ফলে ভিতরে ভিতরে গুমরে মরলেও অনেক সময় কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হয় না। শুনলে অবাক হবেন যে, দৈনিক করতোয়ায় রাতের শিফটে জনপ্রতি সাড়ে তিন টাকার নাস্তা বরাদ্দ ছিল, একদিন এক হুকুমে সেটা বাতিল করা হলো, অথচ কেও

প্রতিবাদ করতে পারলেন না। একদিন শেখ মাহবুব লেমন নামে একজন সিনিয়র সাংবাদিক গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলেন, তার চিকিৎসার জন্য টাকার দরকার, সহানুভূতিশীল অনেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন, কিন্তু এলেন না দৈনিক করতোয়ার মালিক-সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালু। তিনি অবশ্য একদিন হাসপাতালে শয্যাশায়ী সাংবাদিক বন্ধুটিকে দেখতে গিয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে এসেছিলেন। সাংবাদিক বন্ধুটি ভেবেছিলেন অন্যান্য সাহায্যকারির মতো তাকে হয়তো টাকাটা তার চিকিৎসার জন্য একবারে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এক পর্যায়ে সুস্থ হয়ে যখন তিনি কাজে যোগ দিলেন, তখন দেখলেন মাসিক প্রদত্ত বেতনের টাকা থেকে ওই টাকাটা কেটে নেয়া হলো। তখন সাংবাদিক বন্ধুটি লজ্জায়-ঘৃণায় হতবাক হয়ে যান। এ রকম বহু অপমান-অবহেলা-নিপীড়ন সকল সাংবাদিক-কর্মচারিকেই ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু অনেক কিছুরই প্রতিবাদ করা যায়নি। এই বাস্ত বতার মধ্যে থেকেও সাংবাদিক-কর্মচারী বন্ধুরা যতখানি সম্ভব ভূমিকা রাথার চেষ্টা করেন। আমার বেলাও সেটা করেছেন। দৈনিক করতোয়ার সাংবাদিক বন্ধুদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তারা নির্যাতন-নিপীড়ন ভোগ করেন সরাসরি অর্থে মালিক-সম্পাদকের দালালটির মাধ্যমে। মালিক তার পছন্দসই এই দালালটিকে রেখেছে এই কাজের জন্যই। এই দালালটির কাজ হলো সাংবাদিক-কর্মচারিদের এমন একটি ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে জড়িয়ে রাখা, যাতে করে প্রত্যেকে বিপদের মাঝে থাকে, তারা যাতে সংঘবদ্ধ হতে বা থাকতে না পারে, কখনও সংবাদপত্র বিষয়ক বিধান কার্যকর ও ওয়েজবোর্ড বিধান বাস্তবায়নের চাপ না দিতে পারে, তারা যেন নামমাত্র মজুরিতেই মালিকের দাসে পরিণত হয়ে থাকে। দৈনিক করতোয়া সংবাদপত্রের এই দালালটি এইসব কূটকৌশলের মাধ্যমে সাংবাদিক-কর্মচারিদেরকে সবসময়ই চাকরি হরানোর ভয়ে তটস্থ রাখতে সমর্থ হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো যে সাংবাদিক ইউনিয়ন এইসব অন্যায়-অপকর্মের প্রতিবাদে আন্দোলন করবে সেই ইউনিয়নেও কর্তৃত্ব করার জন্য মালিকের ইচ্ছায় সে সক্রিয়। ফলে বগুড়া সাংবাদিক ইউনিয়নেরও সে একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, আবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিরও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। অর্থাৎ দালালের অবস্থান সব জায়গাতেই।

সুতরাং এই বাস্তবতার মধ্যেও দৈনিক করতোয়ার সাংবাদিক-কর্মচারী বন্ধুরা আমাকে তাঁদের আন্তরিক সমর্থন-সহমর্মিতা জানিয়েছেন, সব সময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, সাহস যুগিয়েছেন, পাশে দাঁড়িয়েছেন, পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন, আমাকে সহায়তার অংশ হিসাবে বিশেষ করে মামলার প্রয়োজনে চাঁদা তুলে আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন। বগুড়ার অন্যান্য সাংবাদিক ও শুভানুধ্যায়িরাও একইভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন। সুতরাং এখানে এমন কথা বলবার অবকাশ নেই যে তারা সহায়তা করেননি। হয়তো প্রকাশ্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে যেসব কার্যক্রম হবার কথা সেগুলো সেভাবে হয়নি বাস্তবিক কারণেই।

**প্রশ্ন :** বিনা বেতনে সাময়িক বরখাস্ত এবং বকেয়া পরিশোধ ছাড়াই চাকরিচ্যুৎ করে আপনাকে যে অবর্ণনীয় বিপদে ফেলে দেয়া হয়, সে অবস্থায় আপনার পাশে কারা দাঁড়িয়েছিল? অর্থাৎ বিপদের সময় পাশে দাঁড়ানোর জন্য আপনি কাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ?

**উত্তর :** আমার সকল সাংবাদিক ও শুভাকাঙ্ক্ষি বন্ধুদের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন, লন্ডনস্থ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অফিস, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এবং আমার আত্মীয় আব্দুল বারীর কাছে। কারণ এঁদের কারণেই আমি ধ্বংস হয়ে যাইনি। এ ছাড়া আমি কৃতজ্ঞ সেইসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র-সংবাদ সংস্থা এবং ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার কাছে যারা আমার বিষয়টি সংবাদ আকারে প্রচার করেছে।

**প্রশ্ন :** আপনার দায়ের করা মামলার ফলাফল কি?

**উত্তর :** মামলার রায়ে আমি বিজয়ী হয়েছি। মাননীয় আদালত বিচার অন্তে দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষের সমস্ত পদক্ষেপকে অবৈধ ঘোষণা করেছে এবং আমাকে চলমান ওয়েজবোর্ড অনুযায়ী চাকরির শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বকেয়াসহ সকল পাওনা পরিশোধ করার এবং আইন অনুযায়ী সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। আদালত সাক্ষ্য-প্রমানের ভিত্তিতে আমাকে দৈনিক করতোয়ার বার্তা সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং কর্তৃপক্ষের 'শিক্ষা নবিস সহ সম্পাদক' দাবিকে নাকচ করে দিয়েছে। অর্থাৎ আমি যে দৈনিক করতোয়ায় সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দিয়ে বার্তা সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম সেটাকেই সঠিক বলে উল্লেখ করেছে। আদালত আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করাকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, ওয়েজবোর্ড বিধান ভঙ্গ করাকে বে-আইনি উল্লেখ করেছে, নিয়োগপত্র না দেয়াসহ কর্তৃপক্ষে আরওসব আনুসঙ্গিক পদক্ষেপকে অবৈধ উল্লেখ করেছে।

আদালতে দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগই প্রমাণ করতে পারেননি। সাক্ষ্য-প্রমাণে কর্তৃপক্ষ দেখাতে পারেননি যে আমি দৈনিক করতোয়ার বার্তা সম্পাদক নই, সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করিনি, আমাকে ওয়েজবোর্ড বিধান অনুযায়ী বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, আমাকে আইনিভাবে সাময়িক বরখাস্ত ও বরখাস্ত করেছেন, যে সংবাদটির কথা বলা হয়েছে সেটি ভুল বা তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ এসেছে–ইত্যাদি।

**প্রশ্ন :** আদালত কবে রায় ঘোষণা করেছে এবং কতো দিনের মধ্যে রায় বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে?

**উত্তর :** আগেই বলেছি আদালতে মামলা দায়ের করেছিলাম ২০০৪ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে। বিচার অন্তে আদালত রায় ঘোষণা করেছে ২০০৪ সালের ২২ জুলাই তারিখে। আর আমাকে দৈনিক করতোয়ার বার্তা সম্পাদক পদে যোগদান করতে দেয়াসহ রায় বাস্তবায়নের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল ২০ দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ২০০৪ সালের ১১ আগস্টের মধ্যে।

**প্রশ্ন :** আদালতের রায় অনুযায়ী আপনি কি কর্মস্থলে যোগ দিয়েছিলেন বা দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষ যথা সময়ের মধ্যে আদালতের রায় বাস্তবায়ন করেছিল?

**উত্তর :** না, দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষ আদারতের রায় বাস্তবায়ন করেনি বা আমাকে কর্মস্থলে যোগদান করতে দেয়নি। আমি কাজে যোগদান করতে গেলে বলা হয় যে, তারা উচ্চ আদালতে আপিল করেছেন। আমাকে তখন হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত একটি পিটিশনের ফটোকপি দেখানো হয়।

**প্রশ্ন :** আপনি তখন কি করলেন?

**উত্তর :** আমি সে অবস্থায় আমার আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করলাম এবং যেহেতু আমি হাইকোর্টের কোন আদেশ পাইনি সেহেতু কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের আইনজীবীর মাধ্যমে আমার আইনজীবীর কাছে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের আদেশের একটি কপি হস্তান্তর করা হয়, যেটি আপিলকারির আইনজীবী স্বাক্ষরিত কপি ছিল। এতে বলা হয়েছিল যে, "...অত্র মামলার গত ইং ২২/৭/২০০৪ তারিখের রায় ও আদেশের অসম্মতিতে

মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৪২২৬/২০০৪ নম্বর রীট মামলা (রীট পিটিশন) আনায়ন করিলে হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মো: জয়নুল আবেদীন ও মাননীয় বিচারপতি শরীফ উদ্দিন চাকলাদার গত ইং ১৪/৮/২০০৪ তারিখে শুনানী অন্তে প্রদত্ত আদেশে গত ইং ২২/৭/২০০৪ তারিখের মাননীয় আদালতের রায় ও আদেশের কার্যক্রম ৩ মাসের জন্য স্থগিত সহ রুলনিশি জারীর আদেশ দিয়েছেন।...” অথাৎ হাইকোর্ট আমার মামলার রায়ের কার্যকারিতা ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেছেন। কিন্তু এখানেও ঘাপলা ধরা পড়ে। যা আমি হাইকোর্টে এসে আমার আইনজীবীর মাধ্যমে জানতে পারি। ঘাপলাটা হলো, রীট পিটিশনের যে নম্বরটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটি ভূঁয়া। ভিন্ন একটি নম্বরে (৪৫২৬/২০০৪) রীট পিটিশন করে আমাকে দেয়া হয়েছে ৪২২৬/২০০৪ নম্বর। যাতে করে আমি বিভ্রান্ত হই। আমি বা আমার আইনজীবীকে সত্যিই প্রথমে বিভ্রান্ত হতে হয়েছেও। পরে বিষয়টি ধরা পড়ে গেছে। মামলার রায়ের বিষয়টি এখন এ অবস্থায় ঝুলে রয়েছে।

**প্রশ্ন :** এরকম অবস্থায় আপনি চলছেন কীভাবে,অর্থাৎ জীবন-যাপনে আর্থিক সংস্থান করছেন কীভাবে?

**উত্তর :** হ্যাঁ, বিষয়টি অবর্ণনীয়। একেবারে শূন্য হাতে আমাকে কষ্টের মধ্যেই চলতে হচ্ছে। আইনগতভাবে আমি দৈনিক করতোয়ায় চাকরিতে বহাল থাকলেও বর্তমান বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ষড়যন্ত্রে চাকরি করতে পারছি না, বকেয়াসহ কোন পাওনার টাকা পাচ্ছি না, আইনগতভাবে চাকরি থাকার ফলে অন্য কোথাও যোগদানও করতে পারছি না। আসলে খুব বিপদের মধ্যে চলছি। পরিবার নিয়ে অকল্পনীয় কষ্টের মধ্যে, কঠিন এক কষ্ট ও দু:খের জীবন-যাপন করছি। ফ্রি-ল্যান্স সাংবাদিকতা করে তো প্রয়োজন পূরণ হয় না।

**প্রশ্ন :** এবার ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। আপনি দীর্ঘ দিনের পুরনো সাংবাদিক, ২৫ বছরেরও বেশী সময় আপনি সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে যুক্ত। এই সময়ের মধ্যে আপনি দায়িত্বশীল কোন্ কোন্ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন? দৈনিক করতোয়ায় যোগদানের আগের কথা বলতে চাইছি।

**উত্তর :** দৈনিক করতোয়ায় যোগদানের আগে আমি ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মাতৃভূমি’র বিশেষ সংবাদদাতা, তার আগে বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক উত্তরবার্তা’র সহকারী সম্পাদক ছিলাম। এছাড়া আমি ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পূর্বালোক’র নির্বাহী সম্পাদক, বগুড়া থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক শরনী’র নির্বাহী সম্পাদক, পাবনা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পাবনা’র সম্পাদক, সাপ্তাহিক বিবৃতি’র সম্পাদক ছিলাম। আমি ১৯৭৯ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক গণকণ্ঠ’র সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাংবাদিকতা পেশায় যাত্রা শুরু করি এবং ১৯৮১ সালে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত জাতীয় সংবাদপত্র দৈনিক বার্তায় অনিয়মিত উপ-সম্পাদকীয় লেখার মধ্যদিয়ে কলাম লেখা শুরু করি।

**প্রশ্ন :** সাংবাদিকতা ছাড়াও আপনি গ্রন্থ লেখক হিসাবে পরিচিত। আপনার কয়টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে?

**উত্তর :** আমার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একাবারেই কম। অপ্রকাশিতই বেশি। আর্থিক অবস্থা না থাকার ফল। আমার প্রথম প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক গন্থ “ঘাতকের পদতলে বসবাস” ১৯৯৪ সালে, দ্বিতীয়টি প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রাজনৈতিক গ্রন্থ “অরণ্য শ্বাপদ” ১৯৯৫ সালে বেরিয়েছিল। এছাড়া বাংলা একাডেমী ও সাহিত্য প্রকাশ থেকে আমার লেখা নিয়ে ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের সম্পাদনায় বেরিয়েছে মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস, ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধে

শহীদ বুদ্ধিজীবী, পুলিশ বাহিনীর মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি। ১৯৯৬-২০০১ টার্মে বাংলা একাডেমী থেকে মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস প্রকাশনার যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতে ‘‘পাবনা জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস’’ রচনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। আমি সেটি রচনা করে পাণ্ডুলিপি বাংলা একাডেমীতে জমাও দিয়েছিলাম, কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সে প্রকল্প বাতিল করে পাণ্ডুলিপি আটকে রেখেছে। ফলে গ্রন্থটি আর প্রকাশ হয়নি।

**প্রশ্ন :** নিশ্চয়ই আপনি এসময়কালে সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য পদকও পেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বলবেন কি?

**উত্তর :** হ্যাঁ, বেশ কিছু পদক পেয়েছি। এরমধ্যে সাংবাদিকতায় চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন স্মৃতি পদক (১৯৯৯ সালে) অন্যতম। এ ছাড়া সাহিত্য কর্মের জন্য উত্তরণ পুরস্কার’৯৪ একটি।

**প্রশ্ন :** আপনি সাংবাদিকতার জগতে শুধু পুরনো বা অভিজ্ঞই নন, কর্মপদের দিক থেকেও শীর্ষ পর্যায়ের। অথচ দৈনিক করতোয়া কর্তৃপক্ষ আপনাকে এক কলমের খোঁচায় শীর্ষ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে দিলো, অর্থাৎ শিক্ষানবিস বানিয়ে দিলো– এ প্রসঙ্গে আপনার মন্তব্য কি?

**উত্তর :** দেখুন প্রকৃত সাংবাদিক কখনও এমন কাজ করতে পারে না। কোন সম্পাদকের কথা তো আসতেই পারে না, কারণ সম্পাদক হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তাঁকে সাংবাদিকতায় সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হয়। যেমন যে কাওকে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে হলে সর্বনিম্ন পদ থেকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়। আমাকে যেমন প্রথমে শিক্ষানবিশ সংবাদদাতা, তারপর সংবাদদাতা, তারপর নিজস্ব সংবাদদাতা, তারপর জেলা প্রতিনিধি, তারপর স্টাফ রিপোর্টার বা প্রতিবেদক, তারপর সহ-সম্পাদক, তারপর সহকারী সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক বা সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হতে হয়েছে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এভাবে ধাপ অতিক্রম না করে, সাংবাদিকতার কিছুই না জেনে মুদি দোকানদার থেকে টাকার বিনিময়ে একটি সংবাদপত্রের মালিকানা কিনে নিয়ে রাতারাতি সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়ে যায়, তাহলে তার কাছে সাংবাদিকতাসুলভ আচরণের কী আশা করা যেতে পারে। একজন মুদি দোকানদার শুধুমাত্র দোকানির মতই আচরণ করতে পারে। সে ব্যবসা বুঝতে পারে, কিন্তু পদমর্যাদার কী বুঝবে? দৈনিক করতোয়ার মালিক-সম্পাদকের ব্যাপারটিও তাই।

দৈনিক করতোয়ার মালিক-সম্পাদক মোজাম্মেল হক লালু আমার বিরুদ্ধে যে সব পদক্ষেপ নিয়েছেন তা শুধু আমার জন্যই অপমানকরই নয়, গোটা সাংবাদিক সমাজের জন্যই অপমানকর। সম্পাদক সমাজের জন্যও অপমানকর। তবে আমাকে কলমের খোঁচায় নিচে নামিয়ে দিতে চাইলেই তো আর আমি নিচে নামছি না। আমি তো তার মতো ভিত্তিহীন নই।

**প্রশ্ন :** আপনি নিজের সম্পর্কে আরও কিছু বলবেন কি?

**উত্তর :** নিজের সম্পর্কে আর বিশেষ কি বলবারই বা আছে। আমি সাংবাদিকতা পেশায় এসেছিলাম ১৯৭৯ সালে সে কথা আগেই বলেছি। তার আগে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাস্তবায়ন, বাংলাদেশকে একটি শোষণমুক্ত-অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল দেশে পরিণত করার জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত ছিলাম। একটি সুন্দর-সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য মাত্র ১২ বছর বয়স থেকেই আমি আন্দোলনে যুক্ত হযে পড়ি। অনেকটা সময় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। আন্ডারগ্রাউন্ড থাকতে হয়েছে।

রাজনীতির জন্য পরিবার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। মাত্র ১৩ থেকে ২৩ বছর বয়সের মধ্যে কারাবরণ করতে হয়েছে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের সময় দু'বার, জেনারেল এরশাদের সময় একবার। জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের সময় সেনাবাহিনী আটক করে এক নাগারে ৭ দিন পৈশাচিক নির্যাতন চালিয়েছিল। যার কারণে আজও পর্যন্ত শারীরিকভাবে নানা সমস্যা নিয়ে কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে মাথায় বিদ্যুৎ শক্ দেওয়া, উল্টোদিকে ঝুলিয়ে রেখে চুলের গোড়া দিয়ে রক্তক্ষরণ করানো, রুলারের আঘাতসহ নানা নির্যাতন খুব ক্ষতি করেছে। যাই হোক আসলে জীবনটাকে আমি উৎসর্গ করেছিলাম দেশ ও জাতির জন্য। যদিও সাংবাদিকতা পেশায় প্রবেশের পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসেছি, কিন্তু নৈতিক আদর্শ থেকে তো সরে আসিনি। দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের অঙ্গীকার রয়েছে এবং আমৃত্যু থাকবে। যে কারণে আমি নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য কিছুই করিনি। আমার কোন আর্থিক সম্পদ নেই। জীবন ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তার জন্য যতোটুকু প্রয়োজন সেটুকুই আমার চাওয়া। সে জন্যই চাকরি করতে হয়। সংসারের এইটুকু না থাকলে গোটা সময়টাই দেশ ও জাতির জন্য ব্যয় করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হতো। কিন্তু বাস্তবতা এতো ভাল সুযোগ দেয়নি।

**প্রশ্ন :** আমি শেষ প্রশ্নে আসছি। আপনাকে সম্পূর্ণ অন্যায় ও আইন বহির্ভূতভাবে দৈনিক করতোয়া থেকে অপসারণ বা চাকরিচ্যুৎ করা হয়েছে। বিষয়টিকে আপনি মেনে না নিয়ে বিশেষ করে আপনি আইনের আশ্রয় নিয়ে সত্যিকার অর্থে ন্যায়সংগত পথে অগ্রসরই শুধু হননি, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে নিপীড়িত-নির্যাতিত সাংবাদিক সমাজের পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন, আপনি তাদের জন্য সাহসী প্রতীক। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না। আপনার মতো সকল নির্যাতিত-নিপীড়িত সাংবাদিক আইনের পথ ধরে নিজেদের শৃঙ্খলমুক্ত করুক– এটাই প্রত্যাশা করি।
এখন শেষ প্রশ্ন হলো, আপনি তো সত্যের পথে আছেন, শ্রম আদালত থেকে এ কারণে রায়ও পেয়েছেন, আশা করি উচ্চ আদালতেও আপনি বিজয়ী হবেন। এই অবস্থায় আপনি সংবাদপত্র বা সাংবাদিক সমাজের জন্য কি প্রত্যাশা করছেন?

**উত্তর :** আমার প্রত্যাশার অনেক কিছু আপনি ইতিমধ্যে বলেই ফেলেছেন। আমি চাই সকল নিপীড়িত-নির্যাতিত সাংবাদিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াক, সংবাদপত্র বিষয়ক আইন-কানুন-বিধান তথা ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ লঙ্ঘন করে যে সমস্ত সংবাদপত্র কর্তৃপক্ষ সাংবাদিক সমাজকে ঠকিয়ে চলেছে, তাদের সুষ্ঠু জীবন প্রবাহকে বিঘ্নিত করছে, সংবাদপত্র-সাংবাদিকতাকে লক্ষ্যচ্যুৎ করছে– তার বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াক, এটাই প্রত্যাশা করি। আমি মনে করি এটা হলেই আমি সফল। এতে করে সাংবাদিকতা সত্যিকারের মর্যাদা ফিরে পাবে। সেইসঙ্গে সাংবাদিকতা পেশায় যাতে সাংবাদিকেরাই থাকে, বিশেষ করে সর্বোচ্চ পদ হিসেবে সম্পাদকের পদে যাতে পেশাদার ব্যক্তিরাই অধিষ্ঠিত হয়, অপেশাদার বা অযোগ্যরা বিতাড়িত হয়– সেটাও প্রত্যাশা করি। এ ক্ষেত্রে শক্ত আইন থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। সেইসঙ্গে বলতে চাই বগুড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক করতোয়ার সম্পাদক-প্রকাশক মোজাম্মেল হক লালু সাংবাদিক নির্যাতনে যে ভূমিকা রেখে চলেছে, তার পেছনে আর্শীবাদ রয়েছে বর্তমান চারদলীয় বিএনপি-জামাত জোট সরকার। বিশেষ করে কথিত হওয়া ভবনের কর্ণধার তারেক রহমানের অনুগত ও বিশ্বস্ত ক্রীড়নক হিসেবে মোজাম্মেল হক লালু বেপরোয়া তৎপরতায় লিপ্ত। ফলে জোট সরকারের এই তিন বছরে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অকল্পনীয়ভাবে লাভবান হয়েছেন। আমি চাইবো ভবিষ্যতে কোন গণতান্ত্রিক সরকার যেন এধরনের গণবিরোধী ব্যক্তিকে আশ্রয়-প্রশ্রয় না দেয়, কোন কৌশলের

আশ্রয় নিয়েই যেন এই রকম স্বার্থবাদীরা স্বার্থ হাসিল করতে না পারে। সেইসঙ্গে সরকার যেন সংবাদপত্রগুলোকে আইনি বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হতে বাধ্য করে।

**প্রশ্ন :** দীর্ঘ সাক্ষাতকার দেবার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

**উত্তর :** আপনাকেও ধন্যবাদ।